চার সন্ত্রাসী

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সকাল সাতটায় বদিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল আলফাজ। বদি ঘুমিয়েছে রাত দুটোয়, সে উঠতে চাইছিল না। কিন্তু আলফাজের ডাক খুব তীক্ষ্ণ, যেন ট্রেনের হুইসেল। বদি না উঠে পারল না।

ট্রেনের কথাটা এমনি এমনি উঠল না। উঠল এজন্য যে, ট্রেনটা গুরুত্বপূর্ণ বদি এবং আলফাজের জীবনে। ট্রেনের তেল চুরি করেই তাদের সচ্ছলতার দিকে যাত্রা শুরু, সেই দশ বছর আগে, যখন তেজগাঁও স্টেশনটা অতটা নিষ্প্রভ ছিল না। বদির বয়স তখন বাইশ, আলফাজের তেইশ: কিছু পরে জোটা তার অন্য দুই বন্ধু মতি আর সুমনের যথাক্রমে চব্বিশ ও একুশ।

এখন তারা ত্রিশের ঘরে— অংকের হিসাব তাই বলে; কিন্ত অংকের হিসাব সবসময় মেলে না। যেমন, মতিকে দেখলে মনে হবে চৌত্রিশ অথবা চুয়ান্ন যা-ই লোক, বাকি তিনজন থেকে যত বড়ই হোক, তাদের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। চারজনের এই দলটির নেতা আলফাজ। তেজগাঁও-কারওয়ান বাজার-এফডিসি গেট এলাকায় তাদের সবাই চেনে আলফাজ বাহিনী বলে। খবরের কাগজে তাদের পরিচয় টপ টেরর, পুলিশের খাতায় দাগী আসামি এবং সন্ত্রাসী।

ট্রেনের দল থেকে শুরু হয়েছিল আলফাজ বাহিনীর। এরপর তারা মনোযোগ দিয়েছে কারওয়ান বাজারের মাছ-তরকারি অথবা মাছবোঝাই ট্রাক যে হাওয়া হয়ে যেত, ড্রাইভারেকে হয়তো পাওয়া যেত কেনো রাস্তার পাশে অচেতন, এবং হেল্পারদের পেতে হময় লাগত আরো বেশি, তার কারণ ওই চারজন। চালককে তারা, খবরের কাগজের ভাষায়, 'নেশা জাতীয় দ্রব্য' খাওয়াতো, হেল্পারদের পিটিয়ে তক্তা বানাত, এবং তারা পালিয়ে বাঁচত। তারপর সেই ট্রাকের জিনিসপত্র তারা তুলে দিত ঠাটারি বাজারের ধনু মিয়ার হাতে।

ধনু মিয়ার কাজ ছিল কালোবাজারি করা। লোকটার এমনি নেশা ছিল এই কালোবাজারে যে, ভারত থেকে মিষ্টি পর্যন্ত এনে ঢাকার কালোবাজারে তিনি বিক্রি করতেন। আলফাজকে বলতেন, 'ভাই আলফাইজ্যা, ব্যবসা করতে গিয়া যদি সেইটা নেশা না হয়, তাইলে করবা না।' সবসময় লাভ গুনতে সে মানা করত আলফাজ বাহিনীকে। বলত, 'মাঝে মাঝে লুকসান দিবা, তাইলে লাভ কী, তা বুঝবা।' ভারত থেকে মিষ্টি এনে ধনু মিয়া নিশ্চয় লোকসান দিতেন, কিন্তু নেশা বলে কথা। লোকে বলে, চোরাচালানের পয়সা মেটাতে গিয়ে তিনি তার প্রথম বউকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

সত্য-মিথ্যা উপরওলা জানে।

কিন্তু তার ঘরে যে এখন দ্বিতীয় বউ, তাও বয়সে অল্প, তাতে মানুষ এমন কথা বলতেই পারে। দ্বিতীয় বউয়ের নাম ফারহানা। ফারহানা নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল ধনু মিয়ার। প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল আঞ্জু আরা। ফারহানা অবশ্য আঞ্জু আরার কথা জিজ্ঞেস করেনি ধনু মিয়াকে, যদিও সে জানত, বউটি এক বিকেলে দুই ছেলেকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ধনু মিয়ার বাসায় আগের রাতে মদের ও জুয়ার আসর বসেছিল, সেখান আঞ্জু আরাকে বাজি ধরেছিল ধনু মিয়া। বাজিতে সে হেরেছিল। কিন্তু যে জিতেছিল, সে আঞ্জু আরার সামান্যটুকু সোনার গয়না নিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সত্য-মিথ্যা ফারহানা জানে না, সে এসব শুধু শুনেছে।

সেও বিয়ের তিনদিন পর এক বিকেলে একটা বাসে চেপে আইলটগঞ্জ চলে যেতে চেয়েছিল। তার মনটা পড়ে আছে আইলটগঞ্জে, আরো নির্দিষ্টভাবে, আইলটগঞ্জের প্রতাপপুরের একটা ছাতিম গাছের নিচের মাটিতে, যার নিচে শুয়ে আছে লিমন তাকে ভালোবাসত, সেও লিমনকে। বিয়েও হয়েছিল তাদের। লিমন মিয়ার সঙ্গে। গণি মিয়ার কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল লিমন মিয়ার। একদিন ওই টাকা চাইতে গিয়ে তার কথা কাটাকাটি হয় গণি মিয়ার সঙ্গে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে...

না, গণি মিয়া একটা হাতও তোলেনি লিমন মিয়ার ওপর। লোকটা সজ্জন। কিন্তু দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না তার। সে লিমনকে আর কটা দিন সময় দিতে বলেছিল, কিন্তু লিমনের রক্ত সবসময় গরম থাকত। সে সময় দিতে মোটেও রাজি ছিল না। বস্তুত, কথা-কাটাকাটির কাটাকাটিটা সে-ই করছিল, কথা বলছিল গণি মিয়া। মিলন কথা বলছিল উত্তেজিত স্বরে, নাকচোখ কুঞ্চিত করে। উত্তেজিত লিমন একসময় বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। তারপর গড়িয়ে পড়েছিল মাটিতে।

সেই মাটি থেকে শেষে প্রতাপুরের ছাতিমতলার মাটির নিচে।

বেচারা ফারহানা। তার কী দোষ! সে তো মাত্র জীবন শুরু করেছিল।

কিন্তু ধনু মিয়া কীভাবে খবর পেল স্বামীহারা, পিতৃহারা, মামার সংসারে গলগ্রহ ফারহানার কথা?

পেল কারণ গণি মিয়া ছিল — এখনো আছে — ধনু মিয়ার অগ্রজ।

দুই

বদির সাত-সকালে ওঠার সঙ্গে ফারহানা অথবা গণি মিয়ার কী সম্পর্ক এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্নটা যতটা অসহিষ্ণু, উত্তরটা হতে হবে ততটাই সহিষ্ণু। ঠাণ্ডা মাথার। কারণ এই উত্তরের সঙ্গে অনেক মানুষের জীবন এবং মৃত্যু জড়িয়ে আছে, অনেকের পথে বসা অথবা পথে ওঠা এবং অনেকের সঙ্গে অনেকের সম্পর্কের কথাও আছে এই উত্তরে।

উত্তরটা আর কিছু না! উত্তরের নামে দু'পা এদিক-সেদিক গিয়ে বদি-আলফাজ আর ধনু মিয়া-ফারহানার গল্পটা বলা। গণি মিয়া আমাদের গল্পের জন্য আর মূল্যবান নন, গণি নিয়া বিদায় হতে পারেন, মো. লিমন মিয়ার মতোই, যে একটা কংকালে পরিণত হয়েও এখানো ফারহানার চোখের আলো। রাতে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্ভোগ করেন ধনু মিয়া — তবে বেশিক্ষণ না, কারণ ধনু মিয়া দুই মিনিটের বেশি তার ধনটাকে ধরে রাখতে পারেন না —ফরহানা শুধু লিমন মিয়ার কথা ভাবে... এখন লিমন মিয়া তার তলপেটে হাত দিয়েছে... তার দুই উরুকে দুদিকে সরাচ্ছে...ইত্যাদি।

ফলে তার নিজেকে নিয়ে যেরকম ঘৃণা হওয়ার কথা ছিল সেরকম হয় না। সে ভোরে উঠে নামাজ পড়ে জায়নামাজে বসেই কাঁদে। আর প্রার্থনা করে, লিমন নিয়াকে সে যেন এই জীবনে আরেকবার পায়। ফারহানা এ-ও জানে, ধনু মিয়া যত বর্বর হোক, সে তার কালিমা পড়া স্বামী। একটা চরম বিপদে সে তাকে উদ্ধার করেছে। এজন্য তার প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞও সে। আরো জানে, ধনু মিয়াকে ছেড়ে সে কোথাও যেতেও পারবে না। এক সেই ছাতিমতলা ছাড়া। কিন্তু ছাতিমতলায় রাত্রি নামলে কে তাকে দেখবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে?

তার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে, কেন, লিমন মিয়া?

ফারহানার কান্না তাতে আরো বেড়ে যায়

তিন

ধনু মিয়ার স্ত্রী-নেশা এক মাসের মতো ছিল। এই এক-মাস যত সময় পারতেন ঘরেই কাটাতেন। কিন্তু যত তার দুই মিনিটের আয়ু কমে দেড় মিনিট-এক মিনিটের দিকে আসতে থাকল, তত তার মনটা খারাপ হতে থাকল, ঘর থেকে মনটা উঠে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, কিছুদিন হালকা থাকুক ফারহানা। নিজে বরং একটা ডাক্তার দেখাবেন, ওষুধ নেবেন। রাস্তার পাশে যেসব হাকিম-কবিরাজ তার মতো মানুষের অসুখের এলাজ দেয়, তাদের তিনি বিশ্বাস করেন না। একবার এক হাকিম থেকে এক ধরনের তেল কিনে ব্যবহার করে বিরাট ধাপ্পা খেয়েছেন। কিছুদিন এমন যা হয়ে গিয়েছিল যে, তার ধনটা যে খসে পড়েনি, তাই রক্ষা।

কিন্তু এক মাস তার ব্যবসায় লোকসান গিয়েছে। বিশেষ করে মাছের। লোকসান তুলে নেওয়ার আশায় ধনু মিয়া আলফাজদের বলেছেন তিনটা ট্রাকের যোগান দিতে।

কিছুদিন থেকে আলফাজ একটা ফাইন স্টার পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখতে দুর্ধর্ষ দেখায়। সে ইচ্ছে করে দাড়ি কামায় না। চোখ লাল করে রাখে। লাল করে রাখার জন্য রতে বেশ মদও খেতে হয় তাকে। পিস্তল অবশ্য বদিরও আছে, তবে সেটি চেক রিপাবলিকে তৈরি, আলফাজের মতো এত স্মার্ট না। সুমনেরও পিস্তল আছে। তারটাই সবচেয়ে কম দামের, তৈরি চায়নাতে। মতি পিস্তলে বিশ্বাস করে না। তার আছে এক হালি আনারস, অর্থাৎ আর্জেস গ্রেনেড। এগুলো সে কিনেছে পোস্তাগোলার নিয়ামত থেকে। যেদিন সে কিনে আনে গ্রেনেডগুলো, তার দুদিন পর র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা যায় নিয়ামত। এ খবর শুনে মতি পালিয়ে ছিল পনেরো দিন।

তাদের জন্য তিন ট্রাক মাছ যোগাড় করা কঠিন কিছু না, যদিও ক'দিনের ব্যবধানে তিনটি ট্রাক উধাও হলে পুলিশ নড়েচড়ে বসবে। তাতে বেশ কিছুদিন আর কারওয়ান বাজারে সমস্যা করা যাবে না, তাদের যেতে হবে অন্য কোথাও। এজন্য তিন ট্রাকের দাম তারা প্রায় দ্বিগুণ হাঁকল। ধনু মিয়া অনেক দফা করে একটা জায়গায় এনে আলফাজ বাহিনীকে রাজি করলেন, কিছু অগ্রিমও দিলেন। তারপর মাছ ডেলিভারি পেলে বেশ চালাকি করে কিছু ছাড়লেন বাজারে, কিছু চালান করলেন এক হিমাগার মালিকের জিম্মায়। হিমাগার মালিক দিন - তিনেক পর সেগুলো চলমান করলেন মোহাম্মদপুর আর নিউমার্কেটে।

চালানটা ইলিশ মাছের। ইলিশ কে কবে তাজা খেয়েছেন, বলুন? তবে চালানটা যে ইলিশ, আলফাজ বাহিনী তা জানত না। সিজনের বাইরের ইলিশ, চড়া দাম, ধনু মিয়ার লোকসান তো মিটলই, লাভের ভাগটা হলো অকল্পনীয়।

খবরটা আলফাজ বাহিনী পেল, এবং তাদের মেজাজ খারাপ হলো। তারা ধনু মিয়াকে বলল, টাকার অংক বাড়াতে হবে।

ধনু মিয়া বললেন, না।

বদি বলল, কী বললেন?

ধনু মিয়া বললেন, না মানে না।

আলফাজ বলল, ঠিক আছে, না যখন কইছেন, তখন আপনে না-ই কন। আপনারে দিয়া হ্যাঁ কওয়ানোটা আমার।

ধনু মিয়া তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাদের সঙ্গে যে-চুক্তি হয়েছে, তিনি তো তা দিচ্ছেন, তবে কেন গণ্ডগোল? 'আলফাইজ্যা,' তিনি বললেন, 'ভাই তোমাগো লাগে কি একদিনের ব্যাবসা?

আলফাজ হেসে বলল, টেকাটা দিয়া দিলেই তো পারেন। ব্যবসাটা থাকে, সম্পর্কটাও থাকে। কিন্তু ধনু মিয়ার রাগ উঠেছে। তিনি একবার না বলেছেন, এখন হ্যাঁ বলতে পারবেন না। 'আগামীবার নিও', তিনি বললেন, 'কিন্তু আলফাইজ্যা, এইবার পারুম না।'

আলফাজ চোখে আগুন ঢেলে তাকাল ধনু মিয়ার দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টাকাগুলি নিল। ধনু মিয়া খুশি হয়ে আরো এক হাজার দিলেন। 'রাইতে এইটা দিয়া মাল খাইও। আমার হইয়া পাঁচটা চুমুক দিও।'

ইত্যাদি।

চার

ধনু মিয়ার সঙ্গে সমস্যা করাটা পছন্দ করেনি মতি। এমনিতে মতির মেজাজ খুব চড়া। লোকে আলফাজ থেকে তাকে বেশি ভয় পায়, কিন্তু ধনু মিয়াকে, কেন জানি, খুব খারাপ লাগে না মতির। এই খারাপ না লাগার একটা কারণ অবশ্য ফারহানা। যে দুই-একবার মেয়েটাকে সে দেখেছে, অপলক তাকিয়ে থেকেছে। ফারহানা শাড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখে, গায়ে একটা চাদর পরে, কিন্তু মতি মিয়ার চোখের সামনে নিজেকে তার বস্ত্রহীন মনে হয়। মতি মিয়ার সারা শরীর দিয়ে একটা শিরশির করা রসের স্রোত বয় ফারহানার শরীরের যে-কোনো জায়গায় চোখ রাখলে। ধনু মিয়ার চোখে এই রস-অবশ দৃষ্টি অবশ্য ধরা পড়ে না। তার চিন্তা টাকা। এবং কালোবাজার।

মতি বলল সবাইকে, ধনু মিয়া যা দিচ্ছে, তা-ই সই। এইটা নিয়া আর চিন্তা করার দরকার নাই। তার ইচ্ছা, ব্যাপারটা এখানেই নিষ্পত্তি হোক। লাভ তো মন্দ হয়নি। ধনু মিয়া মদ খাওয়ার জন্য যে পয়সা দিয়েছে, তা দিয়ে বরং ফুর্তি করা যাক। তাছাড়া পরের দিন বিরাট কাজ। বেনোনিয়া-ত্রিপুরা সীমান্তের একটা পিলার থেকে ম্যাগনেট নিয়ে এসেছে নিতাই সাধু। সেটি হাতিয়ে নিতে হবে। কাজটা সহজ না। চারজন লোক পাহারা দিচ্ছে। নিতাই এটা বিক্রি করবে সাতক্ষীরার নূর আলী বিশ্বাসের কাছে। তার আগেই...

মতির কথায় সরাসরি কোনো উত্তর দিলো না আলফাজ। শুধু বলল, লোকটা আমার চোহের দিকে চাইয়া রাগ দেখাইছে। কামটা ভালা করে নাই।

মতি জানে, আলফাজের অভিধানে এর একটাই অর্থ। ধনু মিয়াকে সে দেখিয়ে দেবে। এবং তা যদি নতুন কেনা ফাইভ স্টার দিয়ে হয়, তাহলে ধনু মিয়ার জন্য খবর আছে।

মতি মিয়া দেখল, বাকি দুজনও আলফাজের দলে। সুমনের আঁতে খুব লেগেছে। তারা টপ টেরর। সন্ত্রাসীদেরও সন্ত্রাসী। তাদের এভাবে ধমক দেবে

একটা ছিঁচকে ব্যবসায়ী?

আলফাজ নিশ্চয় একটা চিন্তাও করে রেখেছে ধনু মিয়াকে নিয়ে। কিন্তু আপাতত সে চিন্তাটা মতি জানল না। আলফাজের মোবাইল বাজল। মোবাইলে একজন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল।

দেখা গেল, নিতাই সাধু তাদের চিন্তা থেকে একটু বেশি গাগু। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। আলফাজের রাগটা এবার ভিন্ন একটা গন্তব্য পেল। সে - গন্তব্যের নাম শনির আখড়া। সেখানে নিতাই সাধুর সঙ্গে শিংয়ে ঘষা। নিতাইয়ের সঙ্গে আছে তার টেন্ডল খাইরুল। ম্যাগনেটটা আছে খাইরুলের ভগ্নিপতির টায়ার টিউরে দোকানে। সেখান থেকেই সেটিকে উদ্ধার করতে হবে।

পাঁচ

শনির আখড়ায় সে-রাতে শনির দশা হলো খাইরুলের। নিতাই পালায়। ম্যাগনেটটা হাতে এলো আলফাজ বাহিনীর; কিন্তু সেটা ধরে রাখা ঠিক হবে কি না, ভাবতে ভাবতে প্রায় বিপদেই পড়া তারা। শ্যামপুরের শেকুল হাজীর কাছে জিনিসটার খবর গেছে। হয়তো নিতাই পৌঁছে দিয়েছে, কে জানে। শেকুল এখন জিনিসটা চায়। শেকুল মোটেও হাজী না, কিন্তু নিজেকে হাজী বলে দাবি করে সে। তাতে একটা সমীহ-দেয়াল তৈরি হয়। মানুষজন ওই দেয়াল টপকে তার খারাপ দিকটা দেখতে উৎসাহ পায় না।

শেকুল হাজী দুর্ধর্ষ খারাপ লোক। আলফাজ যদি দুর্ধর্ষ খারাপত্বে দশে ছয় পায়, শেকুল পায় নয় দশমিক পাঁচ। আলফাজ তাই ম্যাগনেটটা এক লাখ টাকায় শেকুলের কাছে ছেড়ে দিলো। আলফাজ দুর্ধর্ষ হলেও তারও জানের ভয় আছে। তাছাড়া শনির আখড়া থেকে হাত-পা ঠিকঠাক নিয়ে তেজগাঁও ফিরে আসটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো। তাছাড়া আলফাজের সোর্স হঠাৎ মোবাইল বন্ধ করে দিলো। জিগো চো জিগোয এথন এই ম্যাগনেট নিয়ে সে কী করে? সোর্স সব খবর দিলো। কে কখন কোথা থেকে এটি নিয়ে যাবে, কত টাকা দিয়ে, সেসবও তার দেওয়ার কথা ছিল। এখন হঠাৎ সে কেন মোবাইল বন্ধ করে দিলো? সে কি শেকুল হাজীর লোক?

ছয়

সকাল সাতটায় আলফাজ এসে বদির ঘুম ভাঙাচ্ছে, বদির উঠতে মন চাইছে না, অথচ উঠতেও হচ্ছে, কারণ তাদের এখনি পালাতে হবে। ভোররাতে ম্যাগনেটসুদ্ধ ধরা পড়েছে শেকুল। আলফাজের সোর্স তাকে মোবাইলে জানিয়েছে, সকালে আর নাশতা করন লাগব না, বস, ফুটেন। র‍্যাব বলে কথা। তারা কুমিল্লা যাওয়ার কথা ভেবেছে। মতি আর সুমন কমলাপুর চলে গেছে। আটটায় একটা ট্রেন আছে, তারা জানিয়েছে। ট্রেনটা সাতটার নাকি সাড়ে সাতটার, ছাড়তে দেরি হচ্ছে। তাতে সমস্যা নেই। বদির রেডি হতে দশ মিনিট। অর্থাৎ প্রাতঃকৃত্য যতটা সময় লাগে।

চারজন আলাদা হয়ে তারা ট্রেনে উঠেছে, আলাদা নেমেছে। কুমিল্লায় মতির বন্ধু বাবর থাকে। বাবরের বড় একটা লন্ড্রি আছে। সে পুলিশ লাইনের কাপড় ধোয়ার ঠিকা পেয়েছে। তবে মতি জানে, সেটা তার বাইরের পরিচয়। তার আসল পরিচয় চোরাকারবারি। আগরতলা থেকে শাড়ি এনে সে বিক্রি করে। তার লন্ড্রি থেকে কেউ যদি দশটা শাড়ি কিনে নিয়ে যায়, দেখে মনে হবে শাড়িগুলি যেন মেসার্স যুবরাজ। লন্ড্রি থেকে ধুইয়ে ইস্ত্রি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেন এগুলো একদিন আগে আগরতলা থেকে আসেনি।

যুবরাজ বাবরের একমাত্রছেলে, যদি জানতে চান।

বাবরের কাছে তাদের আসার প্রধান কারণ, আগরতলার সঙ্গে তার যোগযোগটা উত্তম। শেকুল হাজীকে প্যাঁচদানি দিয়ে র‍্যাব যদি আলফাজ বাহিনীর খবর পায়, তাহলে দেরি হবে না। তখন আধঘন্টার নোটিশে বর্ডার পার হয়ে চলে যাওয়া যাবে র‍্যাবের হাতের বাইরে। একটা অপ্রধান কারণও অবশ্য ছিল — বাবর জুয়া খেলায় নিয়মমতো হারে। বড় দানে জুয়া খেলে, আর হারে। কিন্তু রাগ করে না। মন খারাপ করে না। বরং হাসে। জুয়া খেলার সময় মদ খাওয়ায়। মতি বলেছিল আলফাজকে, সাত - আটটা দিন কুমিল্লায় ফুর্তি করন যাইব, বস। কি কও?

কী আর বলবে আলফাজ। সে এক কথায় রাজি।

সাত

সন্ধ্যায় লন্ডির পাশের চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে বাবর বলল, গণি মিয়া মারা গেছে।

কোন গণি মিয়া?

কান্দিরপারের গণি মিয়া। আড়তদার।

ধনু মিয়ার ভাই।

ধনু মিয়া?

আলফাজের মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। ধনু মিয়ার নাম সে শুনতে চায়নি। লোকটার সে হিসাব নিবে। নিবেই নিবে। আজ সন্ধ্যায় যখন তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন ধনু মিযার নামটা আরো বিষের মতো লেগেছে তার কাছে।

ধনু মিয়ারে তুমি চিন ক্যামনে? মতি জিজ্ঞেস করল।

বাবর উত্তর দেয় না। শুধু দাঁত বের করে হাসে।

মতি বুঝল। চোরাকারবার। এক চোরাকারবারি চেনে আরেক চোরাকারবারিকে। তাতে আর আশ্চর্য কী?

ভাইটার দাফনে আইছে। বউরে নিয়া।

এবার মতির চুল খাড়া হয়ে গেল। উত্তেজনায়। ফারহানা এখন কুমিল্লায়। কুমিল্লায়?

বস একটু ফোন লাগাও। ধনু মিয়ার সঙ্গে একটু কথা কমু, মতি বলল আলফাজকে।

ধনু মিয়ার সঙ্গে মতির কথা বলার বিষয়টিতে আলফাজ রেগে গেল। কিন্তু এখন রাগ দেখালে চলবে না। এখন মতির বন্ধু বাবরের দয়ায় আছে

তারা। মতির ওপর রাগ করলে বাবরও ক্ষেপে যেতে পারে। দুইজনে তারা জানি দোস্ত।

আলফাজ তার মোবাইলটা বের করল।

আট

বড়ভাইয়ের দাফন শেষে খুব বিমর্ষ ছিলেন ধনু মিয়া। তার বিমর্ষ হবার আরো কারণ, ভাইটির সঙ্গে শেষ দেখার সময় একটু রাগ করেছিলেন তার ওপর। ঢাকায় কাজে এসেছিলেন গণি মিয়া। ভাইয়ের বাসাতে উঠেছিলেন। বিমর্ষ ফারহানাকে দেখে গণি মিয়ার খারাপ লেগেছিল। ধনু মিয়াকে এজন্য তিনি বকাও দিয়েছিলেন। ধনু মিয়া তাতে একটু রেগে গিয়েছিলেন। ফারহানা-বিষয়ে কেউ কিছু বললে তিনি রেগে যেতেন। তার কারণ তার রাতিক্রিয়ার আয়ু পরিমাণ কমাতে থাকা। যত তিনি অসমর্থ হচ্ছিলেন, তত ফারহানাকে নিয়ে কেন জানি তার রাগ, অভিমান আর বিরক্তি তৈরি হচ্ছিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ধনু মিয়া ভাবলেন, মৃত ভাইটাকে নিয়ে ফারহানা একবারও দুঃখ দেখায়নি। কিছু বলেওনি। যেন গণি মিয়া নয়, মারা গেছে তার ড্রাইভার আইজু মিয়া।

আলফাজের ফোন পেয়ে তাই একটু চাঙ্গাই হলেন ধনু মিয়া। আলফাজের গলায় রাগ নেই, যদিও শীতল। কিন্তু মতি যখন কথা বলল বেশ উচ্ছ্বাস দেখা গেল তার গলায়। তাতে ধনু মিয়া খুশি হলেন।

ধনু মিয়া যে কুমিল্লায়, সে-খবর শুনে মতি খুব পুলকিত। কিন্তু গণি মিয়ার মৃত্যু নিয়ে কথা বলার সময় গলাটা একটু কোমল হলো তার। তাতে ধনু মিয়ার গলা আর্দ্র হলো। মতি বলল, তারা ঘন্টা দুযেকের মধ্যে বসবে। একটু পান করবে। দু-এক দান তাস খেলবে। ধনু মিয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিলে তারা খুশি হবে।

খুশি ধনু মিয়াও হলেন। তার ভেতরটা খুব গুমোট ছিল। এখন গুমোট ভাবটা কেটে যাবে।

মুন্সিফ কোয়ার্টারে বাবরের লন্ড্রি। রাত নটায় লন্ড্রি বন্ধ হয়। সামনে ঝাঁপ ফেলে লন্ড্রি পেছনের ঘরে আলফাজ বাহিনী বসল মদ খেতে। দুই বোতল ব্যাগপাইপার। উত্তম ভারতীয় হুইস্কি। সঙ্গে কাবাব। গরুর ঝাল তরকারি। নানা।

ধনু মিয়ার আসতে আসতে সাড়ে নটা বাজল। আলফাজ বাহিনীর পেটে ততক্ষণে এক গ্লাস করে ব্যাগপাইপার পড়েছে, তাতে তাদের চিত্তসুখ দেখা দিতে শুরু করেছে। তারা ধনু মিয়াকে বসতে দিলো। এতক্ষণ সুমন ছাড়া বাকি তিনজন জুয়া খেলছিল বাবরের সঙ্গে, এবার বদি খেলা ছেড়ে জায়গা করে দিলো ধনু মিয়াকে। বদি মদ খাওয়াকে বেশি পছন্দ করে, জুয়া লেতে তার ততটা ভালো লাগে না। খেলা চলতে থাকল, এবং বাবর হারতে থাকল। ধনু মিয়া প্রথমে জিতলেন, পরে হারতে থাকলেন। জুয়া খেলায় হারলে ধনু মিয়ার হাত কাঁপে। আজো কাঁপতে শুরু করল। সেই কাঁপুনি সামাল দিতে তিনি মদের গ্লাসে বেশি বেশি চুমুক দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সিগারেট।

কিন্তু হার থামাতে পারলেন না ধনু মিয়া। যারা জুয়া খেলে, তারা জানে, একেকটা দিন আসে, যখন কপালটা হয়ে যায় সদরঘাট। সব ফাঁকা হয়ে যায়। কিছুই জোটে না।

রাত বারোটায় ধনু মিয়া দেখলেন, তিনি এক লাখ টাকা হারিয়েছেন। দেখলেন, অর্থাৎ প্রায় টলটল অবস্থায়, আন্দাজ করলেন। বাবর ত্রিশ হাজার হেরে খেলা থামিয়েছে, এবং দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সুমন খেলছে তার জায়গায়। সুমন জিজ্ঞেস করল ধনু মিয়াকে, আর খেলবেন?

ধনু মিয়া ধরা গলায় বললেন, অবশ্যই।

মতি একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, তবে একটা অন্য দান ধরেন।

ধনু মিয়া কাচের মতো চোখ তুলে বললেন, কী দান?

যে-দান জিতলে এইসব টাকা আপনি ফেরত পাবেন— বলে নিজের কোলে রাখা টাকা দেখাল। ধনু মিয়া নগদ খেলেছেন কুড়ি হাজার, বাবর দশ হাজার। বাকিটা বাকিতে। ধনু মিয়া টাকা দেখে খুশি হলেন। নিশ্চয় অনেক টাকা। কয়েক লাখ হবে।

কী দান?

মতি বলল, ধনের আপনার পরিবার?

ধনুমিয়া চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকালেন। তার চোখে নেশার আস্তরণ। গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, পরিবার?

হুঁ, মতি বলল, আপনার বিবি, ইস্ত্রি।

ধনু মিয়া যেন ভারী আমোদ পেলেন এই বহুবিধ বর্ণনায়। বউ কও না কেন, মিয়া? আমার বউ। ঠিক আছে। তারে ধরলাম।

ধরুন গ্লাসটা খালি হয়ে গিয়েছিল। বদি তা ভরে দিলো। পানি কম দিলো। গ্লাসটা এগিয়ে দিতে ধনু মিয়া সেটি এক চুমুকে অনেকখানি খালি করে ফেললেন। হুম, তিনি বললেন, এইবার জিতমু।

কিন্তু জিতমু যে, তাস পড়তেই তো ভুল করতে শুরু করেছেন ধনু মিয়া। তাস ভালো পড়ছে মতি, যে অনেকক্ষণ একটা গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ধনু মিয়া আসতে না আসতেই তার শরীরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। আরে না, ধনু মিয়া না, ধুর, তার চিন্তায় ফারহানা। সে সিন্ধান্ত নিয়েছে, সারা সন্ধ্যায় তিন গ্লাস খেয়েছে কি খায়নি সে। এখন তাই তার হাতে ফারহানার যাবতীয় ভাগ্য।

ধনু মিয়া হারালেন, এবং হেরে তার শুধু হাত না, সারা শরীর কাঁপতে থাকল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন ধনু মিয়া। মতি তাকে শক্ত হাতে ধরল। বলল, বউরে একটা ফোন দেন। বলেন বাসার সামনে থাকতে। আমরা নিয়া আসুম। ওনার সঙ্গে একটু কথা কইয়া আমাগো দাবি মিটাইমু। ব্যাস তারপর বাড়ি চাইলা যাইবেন।

একটু খালি কথা কইবেন, কসম?

কসম।

ধনু মিয়া ফোন করলেন। সুমনকে নিয়ে মতি বেরিয়ে পড়ল। পথে নেমে সুমন দেখল একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে লন্ড্রির উলটো দিকে। মতির মাথায় এত বুদ্ধি! সে কত আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছে।

যদি দান না জিততা? এই বেবিরে কি তাইলে বসাইয়া রাখতা?

আরে ধূর। এক হাজার টেকার মামলা।...তাছাড়া রাখছি কখন কুন কামে লাগে, বুঝ না?

মতি এখন চাঁদে পাওয়া মানুষ।

নয়

গণি মিয়ার বাড়ির সামনে কিছু ঘিঞ্জি দোকান। এই রাতে সব বন্ধ। কয়েকটা কুকুর ঘুরঘুর আর ঘেউ ঘেউ করছে। দু-এক পথচারী।

গণি মিয়ার বাড়িতে লোকজন ঘুমাচ্ছে। ফারহানা সবার চোখ বাঁচিয়ে বাইরে এসেছে। সে বুঝতে পারেনি কেন ধনু মিয়া তাকে বাসার বাইরে থাকতে বলেছে। তার গলা শুনে সে ভেবেছে হয়তো হাসপাতাল থেকে কথা বলছে। সে যে খুব উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হলো, তা না। কিন্তু যেহেতু বলেছে ধনু মিয়া, কীভাবে সে না শোনে?

বাসার সামনে দাঁড়াতে সে একটা স্কুটারের শব্দ শুনল। দুজন লোক নামল। এদের একজনকে সে আগে দেখেছে বলে তার মনে হলো। কিন্তু লোকটার মুখ একটা মাফলারে ঢাকা। অন্য লোকটা বলল, ভাবিজান, আফনারে ধনু সাহেব যাইতে কইছেন।

কোথায়?

এই সামনে। ধনু সাহেব খুব অসুস্থ হইয়া পড়ছেন।

ফারহানা কথা না বাড়িয়ে স্কুটারে উঠে বসল। মতি তার পাশে বসল। মতির পাশে সুমন। সুমনের রাগ হচ্ছে, মতি কেমন দখল করে নিয়েছে মেয়েটাকে!

বাবরের লন্ডির কিছু দূরে স্কুটার থামিয়ে তাকে বিদায় করে দিলো মতি। তারপর দ্রুত হেঁটে পেছন থেকে লন্ড্রিতে ঢুকল। লন্ড্রিতে তখন তাস শেষ, সুধু মদ খাওয়া হচ্ছে। বাবর বাইরে গেছে। আলফাজ ঘুমাচ্ছে। ধনু মিয়া মাটিতে শুয়ে আছে। পাঁড় মাতাল।

মদ আনতে গেছে। মদ শেষ।

ফারহানাকে দেখে লোভাতুর হয়ে উঠল বদি। সুমনের গায়েও শিরশিরি। মতি বুঝল, তাকেই প্রথম চালটা চালতে হবে। ভাই বদি, সে বলল, আমি একটু ওই ঘরে যাই এরে নিয়া, তারপর তুমি আইও?

বদি খুশি হলো। আলফাজ না উঠলেই ভালো। সে বলল, তাড়াতাড়ি কর। ফারহানাকে পাঁজাকোলা করে লন্ড্রির সামনের ঘরে ঢুকল মতি। ঘরটার একপাশে কাপড় ইস্তিরি করার টেবিল। লম্বা-চওড়া ঠিকই আছে, তবে একটু বেশি উঁচু। টেবিলে ফারহানাকে ফেলল মতি। তাকে পাঁজাকোলা করার আগেই চিৎকার দিয়েছিল ফারহানা, তাতে রেগে গিয়ে একটা গামছা দিয়ে মুখটা শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে মতি। ফারহানা জানে, খুব জোরে চিৎকার করলে হয়তো মানুষজন শুনত, এবং সে বাঁচতে পারত। এখন আর কোনো উপায় নেই। সে দেখেছে তিন-চারজন মানুষ। তারা নিশ্চয় ধনু মিয়াকে কিছু করতে দেবে না। ধনু মিয়াকে হয়তো মেরে ফেলবে। তবে ধনু মিয়াকে নিয়ে তার ভাবাভাবির কিছু নেই। সে ভাবছে নিজের কথা। দুই হাত দিয়ে সে প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা করেছে মতি মিয়ার অগ্রাসী হাত। কিন্তু কতক্ষণ? তার শরীর থেকে শাড়ি নেমে গেছে, ব্লাউজটাও। সায়াটা তার আগেই। এখন শরীরে কাপড় বলতে শুধু ওই গামছা। ঘরটাতে আলো কম, সেই আলোয় সে দেখল তার শাড়ি জড়ো হয়ে আছে। মেঝেতে। তার সায়াটাও। তার মাথার দিকে অনেকগুলো শাড়ি ইস্তিরি করা। কিছু পাঞ্জাবি। একটা মশারি। আরো কী কী।

এগুলো দেখছে সে, আর অনুভব করছে দুটি হাত তার শরীরের মাংসগুলি ডলে দিচ্ছে। ওই দুই হাতের ডলা খেতে খেতে হঠাৎ তার মনে পড়ল মো, লিমন মিয়া মাঝে মধ্যে এমনি করে ডলত তাকে। তবে অনেক আস্তে, সোহাগ ভরে। আর তার ভেতরে একটা আন্দ কোলাহল শুরু করত। সে চোখ বুঁজে একটা প্রার্থনা শুরু করল, লিমন মিয়া যেন উঠে আসে সেই ছাতিমতলা থেকে। তাকে রক্ষা করে।

দরজার পাশে একটা জোরে শব্দ হলো। এই মতি, কি করতাছ? আরে, আরে...?

বাবরের গলা। বাবর হতবাক হয়ে গেছে তার লন্ড্রিতে একটা মেয়েতে এনে এভাবে তার লন্ড্রি-টেবিলে শুইয়ে...

বাবরের পেছনে আলফাজ। সেও বিরক্ত। সে বলল মতিকে, এখন না, পরে। মতি বুঝল, আলফাজের আগে তার সম্ভাবনা নেই।

বাবর চিৎকার শুরু করেছে। আলফাজ তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। বাবর ভাই, আস্তে। আপনে বসেন, আমি ব্যবস্থা করতাছি।

বাবর অন্য ঘরের মাটিতে বসে পড়ল। সে ভয় পেয়েছে। সে জানে, এইরকম কিছু হলে তার কী পরিণতি হতে পারে। আলফাজ তাকে অভয় দিচ্ছে। ধনু মিয়া ঘুমাচ্ছে। আলফাজ বলল, আপনার টেহাটা আমরা আসলে জিতি নাই। এইটা ড্রাই খেলছি। টেহাটা মতির থাইকা নিয়ে নেন।

টাকার কথায় কিছুটা শান্ত হলো বাবর। এই মাইয়ার কী অইব? সে জিজ্ঞেস করল।

এহন একটু বাইন্ধা রাখুম, বলল আলফাজ। ভোরবেলা ছাইরা দিমু। ভয় নাই।

আলফাজ ঠিক করে রেখেছে, ধনু মিয়া আর ফারহানাকে কিছু একটা করতে হবে। ভোর হওয়ার আগে। পাশেই যে একটা পুকুর আছে, এঁদো পুকুর, কেউ ব্যবহার করে না, শিগগিরি বুজিয়ে ফেলা হবে, তার অপেক্ষায় আছে, তাতে অনেকগুলো ইট বেঁধে এই দুজনকে ফেলে দিলেই চলবে। এসব কাজ আগেও তারা করেছে। সে-নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু মতির ওপর খুব রেগেছে আলফাজ। ফারহানাকে এখানে নিয়ে আসাটা তারও পছন্দ হয়নি, কিন্তু বেশি অপছন্দ হয়েছে মতির বাড়াবাড়ি। সে কিনা প্রথম খাবে মেয়েটিকে? তারও আগে?

ফারহানা এবার লিমন মিয়াকে বলছে, তুমি আস আমাকে বাঁচাও। তুমি না আমার চোখের আলো?

লিমন মিয়া বলল, আমি এখানেই। ভয় করো না।

ফারহানা বলল, আমার মুখ বাঁধা, হাত-পা বাঁধা। আমি কী করব?

লিমন মিয়া বলল, ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা তোমাকে আর দেখবে না। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে শুধু আমি দেখব।

ফারহানা বলল, তাহলে আমি একটু ঘুমাই? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

লিমন বলল, ঘুমাও। আমি তোমার মাথায় একটা হাত বুলিয়ে দেব। অন্য হাতে ওদের শায়েস্তা করব।

ফারহানা বলল, আচ্ছা।

ফারহানাকে একটা শাড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে খুব শক্ত এবং উত্তেজিত হাতে তার বুকে এবং তলপেটে আঘাত করেছিল বদি। তলপেট ও নাভির নিচের জায়গায় ফারহানা সম্বিৎ হারাল।

আলফাজ বলল, আরো একটু ঢাল, বদি। বাবর ভাইরে দেও।

আলফাজ বাহিনী ক্লান্ত, বিরক্ত, লোভাতুর। তারা সকলেই ভেতরে জিভ চাটছে। আলফাজ জানে, বাবর আরেকটা গ্রাস খেলে ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ফারহানার কাছে যাওয়া যাবে। তারপর মতি। বদি আর সুমন। তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ফজরের আজান পড়ার অনেক আগেই সব শেষ হবে। তারপর একটা বড় ঘুম দেয়া যাবে।

দশ

বদি একবার বলেছিল, কেমন যেন লাগছে, কিন্তু কেউ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু তিন নম্বর গ্রাস খেতে গিয়ে সবাই দেখল, কেমন যেন লাগছে শুধু না, খুব খারাপই লাগছে তাদের। খুব খারাপ । তারা বমি করল। তারপর গোঁ গোঁ করল। মেঝেতে শুয়ে ছটফট করতে থাকল। একসময় মতি বলল, বস, আমি কিছু দেখতে পারছি না। অর্থাৎ সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মতির কথা সোনার জন্য আলফাজ ততক্ষণ জেগে নেই। আলফাজ জেগে নেই শুধু নয়, কোনো দিন জাগার মতো অবস্থা তার আর নেই।

এগারো

অজানা শব্দে ঘুম ভাঙল ধনু মিয়ার। মাথায় তীব্র ব্যথা। উঠে বসে অনেকক্ষণ এদিক সেদিক তাকালেন। আলফাজ আর তার লোকগুলো পড়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক, এখন বাড়ি যেতে হবে। তার বুক পকেটে মোবাইল ফোন। কে রাখল? তিনি তো কখনো বুক পকেটে ফোন রাখেন না? মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন ধনু মিয়া। এটি কি তার? দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, রাতে ফোন করেছিলেন ফারহানাকে। কিন্তু কেন, তার মনে পড়ল না।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে তিনি ঘর থেকে বেরুলেন। দরজাটা কোথায়? এ ঘরের দরজা কি আছে? এ-ঘরে একটা খাট। তাই তো, খাট। খাটের ওপরে কে? কে শুয়ে আছে? ধনু মিয়া চোখ কচলালেন। একজন মানুষ। গায়ের কোনো কাপড় নেই, কিন্তু কেউ যেন শাড়ি জড়িয়ে রেখেছে গায়ে। কে?

ফারহানা গোঙাচ্ছে। প্রাণপণে। ধনু মিয়া মাথা নোয়ালেন। হাত দিয়ে শরীর স্পর্শ করলেন। মেয়েমানুষ! সর্বনাশ?

ফারহানার শরীর কাঁপছে। কাঁপতে থাকা সেই শরীরে আবার হাত বুলালেন ধনু মিয়া। তার হাত গিয়ে ঠেকল যেখানে, সেখানে তিনি প্রতিরাতে ভ্রমণ করেন, আর ফারহানা তীব্র ক্ষোভ এবং কষ্ট নিয়ে সহ্য করতে থাকে, আর প্রার্থনা করে : মো. লিমন মিয়া, তুমি আমাকে বাঁচাও।

ধনু মিয়ার ঘোর কেটে গেল। ফারহানা!

বারো

দুদিন পর খবরের কাগজে এরকম একটা সংবাদ বেরুলো, কুমিল্লায় বিষাক্ত মদ পান করে ঢাকার তিন টপ টেরর নিহত, একজন দৃষ্টি হারিয়েছে, সেও মরমর।

ধনু মিয়া বা ফারহানার কোনো উল্লেখও সংবাদে নেই। এমনি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ধনু মিয়ার মাথা যে, ফারহানার একটু চুলও লন্ড্রিতে ফেলে আসননি। নিজের তো নয়ই।

ফরহানাকে একদিন বললেন ধনু মিয়া, তোমার গায়ে হাত বুলাতে গিয়ে বুঝলাম এটা তুমি, এবং ভাবতে বসলাম, কী করা যায়, আমার মনে হলো একটা চিকন কালো জোয়ান ছেলে আমাকে হাত ধরে বসিয়ে রেখে সব কাজ করল। তোমাকে কাপড় পরাল। সব পরিষ্কার করল। এমনকী আমার মদের গ্লাসটাও। এমনকী আমার মোবাইল ফোনটাও প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো।

তেরো

এক তরুণ পর্বতারোহী এসএমএস করল আমাকে, স্যার, আজকে যে চার টপ সন্ত্রাসী বিষাক্ত মদ খেয়ে মরল, তাদের নিয়ে প্লিজ একটা গল্প লিখুন, ইতি সজল।

আমি লিখে পাঠালাম, আমি মো. লিমন মিয়াকে চিনি। তাকে বলেছি, সে গল্পটা লিখবে, এবং শেষ করবে। কীভাবে করবে তা তোমার সঙ্গে আমিও দেখব।